দি
চেঞ্জিং ল্যাংগুয়েজ
অফ থিয়েটার
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল লেকচার ১৯৮২
বাদল সরকার

দি চেঞ্জিং ল্যাংগুয়েজ অফ থিয়েটার

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল লেকচার ১৯৮২

বাদল সরকার

THE CHANGING LANGUAGE OF THEATRE
Maulana Abul Kalam Azad Memorial Lecture 1982
By Badal Sircar

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৮২
প্রথম বঙ্গানুবাদ সংস্করণ
জুলাই ২০১৬

প্রচ্ছদ
দেবাদিত্য দাস বর্মন

বাদল সরকারের ছবি
স্মিতা দাস

সজ্জা ও বিন্যাস
আবু সোলাইমান দারানি

মুদ্রণ
নস্কর জেরক্স অফসেট
৫/১, রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলকাতা — ৭০০ ০০৯

প্রকাশন
কালি কলম ও ইজেল
৪/১ই, রাধানাথ চৌধুরী রোড
ট্যাংরা, কলকাতা ৭০০ ০১৫

+৯১ ৮৯৮১৮ ২০৩৮০
kalikolomoeasel@yahoo.com

বিনিময়ঃ কুড়ি টাকা

মুখবন্ধ

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১১ই ডিসেম্বর কার্জন পার্কের গাছের তলায়, খোলা আকাশের নিচে অথবা ১৮ই জুন ১৯৭২ কলকাতার এবিটিএ হলে চারদিক ঘিরে বসা দর্শকদের মাঝখানে একটি বিকল্প থিয়েটারের সূচনা করেছিলেন কতিপয় মানুষ, যা আজ তর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কি ছিল সেই ভিন্নরীতির নাটকের দার্শনিক ভিত্তিভূমি? এরকম তিনটি বইয়ের একটি The Changing Language of Theatre. অন্যের গলায় পা না রেখে যে প্রজন্ম যুগের পরিবর্তন চাইবে, ব্যবসার কবল থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করতে চাইবে, চাইবে প্রকৃত ও লোকনাট্যের ভিত্তিস্থাপন করতে তাদের কথা মাথায় রেখে 'কালি কলম ও ইজেল' সহযোগিতার দুনিয়া গড়ার স্বপ্নের কারিগর বাদল সরকারের এই বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে উল্লেখযোগ্য নজির রাখছে যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করবে।

দুলাল কর

পথসেনা নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য

শ্রাবণ ১৪২৩ । জুলাই ২০১৬

যখন আমি থিয়েটারের ভাষা সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করি, প্রথমেই যে প্রশ্নটার মুখোমুখি হই, তা হল—আমি কে? এর সাথে জড়িয়ে থাকে আরো একরাশ প্রশ্ন — আমি কোথা থেকে এলাম? এই জটিল বিশ্বে জটিল সামাজিক কাঠামোর কোথায় আমার অবস্থান? আমার সময়টা কী? আমার ভাষা কী? আমার থিয়েটার কী? আমার থিয়েটারের ভাষা কী?

কথাগুলো অহংসর্বস্ব শোনাতে পারে। কিন্তু তা নয়। প্রশ্নগুলো প্রাসঙ্গিক, কেননা আমি দেশকালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। আমি স্বাধীন, সম্পূর্ণ, শর্তনিরপেক্ষ নই। যে জীবনটা আমি যাপন করছি, যেসব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, যে সমস্ত বিকল্প আমি বেছে নিয়েছি অথবা যা আমাকে বেছে নিতে হয়েছে, সেগুলোই এখন পর্যন্ত আমার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক। থিয়েটারের ভাষা বিষয়ে বলতে গেলে আমি শুধুমাত্র আমার থিয়েটারে আমার ভাষা সম্বন্ধেই বলতে পারবো। 'আমি'র পরিবর্তে খুব সহজেই 'আমরা' শব্দটা ব্যবহার করতে পারি — কেননা উদাহরণস্বরূপ বর্তমানের সঙ্গী হিসাবে সেখানে আমার মতো অনেকেই রয়েছেন। তাই তাই একটা বিশেষ সময়ের, একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থার, একটা বিশেষ শ্রেণির নমুনা বা প্রটোটাইপ হিসাবে আমাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আসুন, আমরা সেটাই করি — আসুন, আমরা আমার মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজন মানুষকে বেছে নিই। লোকটা ভারতীয়, শহুরে মানুষ, কলকাতার মতো এই দৈত্যাকার শহরে জন্মেছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এই দৈত্যটা জীবন্ত এবং তীব্র প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। আমাদের এই প্রটোটাইপ মানুষটা জন্মেছে মধ্যবিত্ত ঘরে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, মধ্য-মধ্যবিত্তের ঘরে। হতে পারে তার বাবা কলকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক, তার ঠাকুরদা গ্রামের কোনো স্কুলের মাস্টারমশাই আর তার ঠাকুরদার বাবার

ছিল সামান্য কিছু জমিজমা। আমাদের আলোচ্য এই লোকটা শিক্ষিত, অর্থাৎ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা নামক কলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে, যার আদ্যোপান্ত ব্যবস্থাটাও ইংরাজি। যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে পড়াশোনার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা, তবু ধরে নেওয়া যেতেই পারে, এমন সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা সে করবে। কারণ সে পড়াশোনা শিখেছে, কারণ তার বাবা তার কলেজের মাইনে দিতে পেরেছিলেন, শুধু তাই নয়, একুশ বছর অব্দি এক সাবালকের ভরণপোষণের দায়িত্বও তিনি সামলেছিলেন। যে দেশে সত্তর শতাংশ মানুষ নিরক্ষর সেই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার শিক্ষার মান উচ্চ, যদিও সত্যিকারের জ্ঞানার্জনের দিক থেকে খুবই নিম্নমানের।

কোন সময়ের মানুষ সে? আমরা ধরে নিতে পারি, ব্রিটিশ অধীনস্ত এক উপনিবেশে তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়েছিল এবং স্বাধীনতার কিছু আগেই সে একজন বেতনভূক কেরানিতে পরিণত হয়েছিল। আর এখন, এই ১৯৮২ সালেও সে বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে।

তার ভাষা? ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বললে, বাংলা, কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে ইংরেজি। কেননা এদেশে, এই শহরে তার শ্রেণির সংস্কৃতিটা ছিল ইংরেজি, এখনো তাই আছে।

একটা বিশেষ সময়ের ফসল এই লোকটা একজন মার্কামারা মধ্যবিত্ত, শহুরে, শিক্ষিত বাঙালি। এক সময়ে এ সমস্ত সে নিজেই বেছে নিয়েছিল, এখন এসব হচ্ছে তার ফল। অবশ্য তার পছন্দগুলো পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না; তার সময়, শ্রেণিভিত্তি এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়েছিল। এমনকি এই ধাঁচাটার মধ্যেও প্রভূত বৈচিত্র্য থাকতে পারে, যা এই লোকটাকে প্রটোটাইপের মধ্যেও একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি

বানিয়ে তুলল।

জীবনের কোনো এক পর্বে অন্য অনেক পছন্দের মধ্যে সে বেছে নিয়েছিল, ধরা যাক, তার নাম থিয়েটার। এইরকম আরো অনেক পছন্দের মতো প্রথমে এটা ছিল তার অবসর-বিনোদন, তার ফাঁকা সময়ের কাজ। কিন্তু ক্রমশ এটাই তার জীবনে আরো আরো বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম অপেশাদারী অভিনয়, তারপর পরিচালনা, শেষমেষ নাটক লেখার চেষ্টা। কারণ সে নাটক বানাতে চায়।

শহুরে মানুষ হওয়ার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই সে প্রথমদিকে নাগরিক থিয়েটারকে, আরো স্পষ্টভাবে বললে তৎকালীন কলকাতার চালু থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছিল। সময়টা ছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ। এই থিয়েটারের ভাষাটাই সে রপ্ত করেছিল। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত থিয়েটার সম্বন্ধে তার হয়ত ভাসা-ভাসা কিছু ধারণা ছিল, কিন্তু সেই থিয়েটারের সাথে তার ওতপ্রোত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

বস্তুত যখন আমরা 'থিয়েটার' শব্দটা ব্যবহার করি, যেটা আদতে একটা ইংরেজি শব্দ, আমরা আমাদের ভাষায় কম-বেশি অঙ্গীভূত করে নিয়েছি, তখন কি আমরা আমাদের চোখের সামনে নাগরিক থিয়েটারকেই দেখতে পাই না? একটা বিশাল হলঘর, দর্শকদের জন্য সারি সারি বসার জায়গা এবং তাদের সকলের চোখ একইদিকে। আমরা যদি দর্শক হই, দেখব, একটা দেওয়ালের দিকে মুখ করে আমরা বসে রয়েছি। দেওয়ালটা একটা বিশাল মাপের ছবির ফ্রেমের মত দেখতে। সেটা একটা ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা। নাটক শুরু হলে আমরা অন্ধকারে ডুবে যাই আর পর্দাটা সরে গিয়ে নাট্যক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই খোলা জায়গাটা বস্তুত ছবির ফ্রেমের পেছনে একটা উঁচু মেঝে,

এই ঘরের মধ্যেই থাকা আরেকটা ঘর। ঐ ঘরটাকে ঘিরেই সমস্ত আলো, সমস্ত কর্মকান্ড, কথা, শব্দ। ওই ঘরে তখন থিয়েটারে তৈরি করা বিশ্বাসের পৃথিবী, তৈরি করা বিশ্বাসের জীবন বইছে আর আমরা অন্য একটা ঘরে বসে আছি, শান্ত নিষ্ক্রিয়, লুকিয়ে আছি অন্ধকারে। ঐ ফ্রেমের ওদিকের কর্মকান্ড একই সাথে বাস্তব এবং অবাস্তব, ওটা বাস্তব নয় বরং বাস্তবের ইলিউশন। মঞ্চের অভিনেতারা আমাদের মত মানুষ, আবার আমাদের মতো নয়ও, আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। যে দরজা দিয়ে আমরা এ ঘরে ঢুকেছি, তারা সেই পথে ঢোকেনি, মঞ্চের কাজকর্ম শেষ হলে তারা অন্য একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এমনকি এখন যখন থিয়েটার চলছে, তখনও তারা আমাদের উপস্থিতি নিয়ে সচেতন নয় এবং তাদের এই অসচেতনতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এর কারণ আমাদের উপস্থিতিকে তারা আদৌ গুরুত্বই দিচ্ছে না, যেন আমরা তাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। আবার একই সঙ্গে আমাদের অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না, কারণ, মঞ্চে তারা যা-ই করছে, সেটা আমাদের জন্যই করছে। আমরা ছাড়া তারা নিতান্তই অপাংক্তেয় হয়ে যাবে।

আমাদের সেই লোকটা যখন থিয়েটারকে বেছে নিল, এই থিয়েটারকেই বেছে নিল, প্রসেনিয়াম মঞ্চ, ফ্রেমের পেছনেরসেই মঞ্চ, যার চালু নাম, প্রসেনিয়াম আর্ক আর প্রেক্ষাগৃহে সারি সারি নম্বর দাগানো বসার জায়গা, নাটকের সেট, স্পট লাইট, পোশাক, মেক আপ, মঞ্চের পিছনে সাজঘর, প্রেক্ষাগৃহের সামনে চাতাল, সেখানে নাটকের বিজ্ঞাপন, টিকিট ঘরে বিভিন্ন দামের টিকিট। আমরা ধরে নিই যে লোকটা এই ধরণের থিয়েটার সম্বন্ধে আপাতভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রায় কুড়ি বছর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তৎসত্ত্বেও এই গোটা সময়টা জুড়ে পরিবর্তনের একটা চাহিদা

প্রায় গোপনে তার মধ্যে কাজ করে গেছে।

'পরিবর্তন' যেন একটা ম্যাজিক। একজন মানুষ এই পৃথিবীর, এই সময়ের বাসিন্দা। কিন্তু সময়ের সাথে দুনিয়াও বদলায়। সাথে সাথে মানুষটাও। চারপাশ তাকে বদলায়, সাথে সাথে সেও অন্যদের সঙ্গে মিলে দুনিয়াটাকে বদলায়। এখানেই লুকিয়ে আছে তার শক্তি। সে এক বিশেষ সমাজের, বিশেষ সময়ের ফসল। কিন্তু সে তার প্রতিটি পছন্দের মধ্য দিয়ে, প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তার ঐ সমাজের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে। সে একা নয়। তার মতো অসংখ্য মানুষ তাদের পছন্দ দিয়ে, কাজ দিয়ে জগতকে বদলে চলেছে। সেটা আরো ভালোর দিকে হতে পারে বা আরো খারাপের দিকে।

প্রচলিত নাগরিক থিয়েটারকে ক্রমাগত কাছে টেনে নেওয়ায় থিয়েটারের সাথে তার অন্তরঙ্গতা যত বেড়েছে, ততই তার মনে জেগেছে অসংখ্য প্রশ্ন। যখন থেকে সে নাটক লিখতে শুরু করল, গজিয়ে উঠল আরো আরো প্রশ্ন। থিয়েটারের মাধ্যমে একজন কতখানি প্রকাশ করতে পারে? একজন সবকিছু নিয়ে ভাবতে বা অনুভব করতে পারে? যদি তা না হয়, তবে লক্ষণরেখাটা কি? একটা নাটকের কতখানি সাহিত্য পদবাচ্য? লেখা নাটক এবং সেই নাটকের অভিনয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কি? নাটকের ভাষা আরথিয়েটারের ভাষার মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রসঙ্গে থিয়েটার কি? থিয়েটারে মাধ্যমে একজন কেমনভাবে নিজেকে কমিউনিকেট করাতে পারে? থিয়েটারের কতখানি বিনোদন, কতখানি নান্দনিকতাআর কতখানিই বা সেটা মেসেজ দেবার উপায়? অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সাথে থিয়েটারের মিল কোথায়? কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য থিয়েটার তাদের থেকে স্বতন্ত্রও বটে? ভারতের প্রেক্ষাপটে থিয়েটার কি?

যে কেউই এর সাথে আরো প্রশ্ন জুড়ে দিতে পারেন, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে যে সমস্ত উত্তর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো হয়ত কখনো সখনো চূড়ান্ত বা পর্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন তৈরির পদ্ধতি আর উত্তর পাবার প্রচেষ্টাই হচ্ছে 'পরিবর্তন'-এর পথ এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা বাড়লে পরিবর্তন হয় — সেটা তো শুধু থিয়েটারের থেকে হয় না, বরং হয় থিয়েটারের সাথে সময়, জীবন ও সমাজের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়াটি জটিল ও বহুমুখী, এমনকি বিভ্রান্তিকর। যখন আর উত্তরগুলো শুধু বিমূর্ত আকারে মনের মধ্যে থেকে যায় না, বাস্তবের মাটিতে তার পরখ করা হয়, তখনই বিভ্রান্তিগুলো কাটে এবং একটা নতুন ছবি উঠে আসতে শুরু করে।

খোঁজা আরম্ভ হয় হাতের নাগালে থাকা জিনিসগুলো খুঁটিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বর্তমানের চলতি নাগরিক থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। একজন নাট্যকার একটা নাটক লেখেন — সেটা শুরু। সঠিকভাবে বললে, নাটক লেখা হচ্ছে একটা সাহিত্যকর্ম, যার একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যাঁরা সেই ভাষাটা জানেন তাঁরা ঠিক কবিতা বা উপন্যাসের মতো সেটা পড়েন। এরপরেই হাজির হন পরিচালক। যিনি এই লিখিত নাটকটিকে বিভিন্ন অভিনেতাদের সাহায্যে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে পরিবর্তিত করেন। আসুন, এই কাজটার আমরা নাম দিই, 'স্কোর' বা বিন্যাস — নাটকের বহু মানুষ এই নামেই এটাকে অবিহিত করেন। যখন অভিনেতারা এই স্কোরটিকে অন্য মানুষের কাছে উপস্থাপন করেন, তখন সেটা আর সাহিত্যকর্ম থাকে না, যাব্যক্তিগত পরিসরে বার বার পাঠ ও উপভোগ করা যায়, বরং দর্শককূল, যারা এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জড়ো হন, তারা এটাকে একটা দৃশ্যশ্রাব্য ঘটনা হিসাবেই উপভোগ করেন। এটাই হচ্ছে 'পারফরমেন্স' বা উপস্থাপনা। যদি প্লে বা লেখা নাটকটা হয় শুরু, তবে পারফরমেন্স হল শেষ এবং

স্কোর হল দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন। প্লে, স্কোর এবং পারফরমেন্স এই তিনটি একত্রে যা তৈরি করে, তাকে আমরা বলি থিয়েটার।

এইজন্য নাট্যকারকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ উপস্থাপনার কথাটাও মাথায় রাখতে হয়। তাকে একই সাথে দুটো শিল্প — সাহিত্য এবং থিয়েটারকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তার ভাষাটাকেও হতে হবে একটা বিশেষ ধরণের ভাষা। এটাকে সাহিত্যের অন্য শাখার ভাষা থেকে আলাদা হতে হবে। কেননা এটাকে দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে হবে, যা একদল অভিনেতা একদল দর্শকের সামনে উপস্থাপন করবেন। এই দুটি দল একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে একত্রিত হয়, যে সময়ের মধ্যে গোটা নাটকটা দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

নাট্যকার এটা একটা গল্পের মধ্য দিয়ে তৈরি করতে পারেন। সাধারণত তাই হয়, বহুকাল ধরে তাই হচ্ছে। গল্পটাকে থিয়েটারের ভাষায় বদলে নিতে হবে, তার জন্য গল্পে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষগুলোর ইন্টারঅ্যাকশন দেখাতে হবে, এরাই নাটকের চরিত্র, অধিকাংশটাই ঘটবে সংলাপের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের ভাষাই হল নাট্যকারের ভাষা। নাট্যকার জীবন থেকেই নকল করছেন। ঐ গল্পের পরিস্থিতি পরিবেশের মধ্যে চরিত্রগুলো ঠিক যেমন আচরণ করলে দর্শকদের আশ মেটে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটকে সংলাপ বলে, আচরণ করে চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য সেই পরিবেশ পরিস্থিতিকেও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, মানে যেটা বাস্তব জীবনে ঘটতে পারে। গল্পের ঘটনাগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে দেখতে হবে, সেগুলো যেন যতদূর সম্ভব বাস্তব জীবনের ঘটনার কাছাকাছি হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনের হুবহু অনুকরণ থিয়েটার নয়। জীবনের অবশ্যম্ভাবী খুঁটিনাটি সব ঘটনা, যা জীবনকে ভারাক্রান্ত করে বা

নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, তেমন আকর্ষণীয় নয়, নাট্যকার সে সব ঘটনা তার নাটকে বাদ দেন। তিনি চাইলেই তার নাটকের চরিত্রদের জীবন থেকে দুটো ঘটনা, তিনটে দিন, কয়েকটা মাস বা আস্তএকটা বছরই বাদ দিয়ে দিতে পারেন। এই সময়ের ব্যবধানটা,সাধারণত, মঞ্চ অন্ধকার করে বা পর্দা ফেলে দৃশ্যান্তর বা নাটকের বিরতির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়। একই উপায়ে আলাদা ঘটনার আলাদা জায়গা বোঝানো হয়।

এই থিয়েটারকে আমরা বলি, 'ন্যাচারালিস্টিক' বাপ্রকৃতিবাদী থিয়েটার। এই জাতীয় থিয়েটারে অভিনেতাদের কর্তব্য হল, নাটকের চরিত্ররা যেভাবে কথা বলে, তাদেরও সেভাবেই বলতে হবে, আচার-আচরণ করতে হবে। পরিচালক তার নাটকের বিন্যাস সেভাবেই করবেন। ভাবনাটা এইরকম, দর্শকদের বোঝানো হবে যে, মঞ্চের ওপরে থাকা মানুষগুলো অভিনেতা নয়, তারা হল গল্পের আসল চরিত্র। মঞ্চটা কোনো উঁচু বেদী নয় বরং এটা সেই জায়গাটা, যেখানে গল্পের ঘটনাগুলো ঘটছে। সংক্ষেপে, দর্শকদের মনে বাস্তবের এক ইলিউশন তৈরি করতে হবে, যাতে সে নিজের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নাটকের চরিত্রগুলোকে চিনে নিতে ও অনুভব করতে পারে এবং তাদের জীবনের টানাপোড়েনে নিজেরা আন্দোলিত হতে পারে।

ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারে নাটক ও নাট্যের ভাষা একই পয়েন্ট অফ রেফারেন্সে থাকে — দেখা যায় এমন একটা বাস্তব জীবন। যদি জীবনের নকলটা নির্ভেজাল হয়, তবে দুটি ভাষার মধ্যেকার পার্থক্যটা খুব বেশি হয় না । এটা একটা চিনতে পারার খেলা। নাট্যকার যে চরিত্রটিকে নাটকে দেখাচ্ছেন, তাকে তিনি চেনেন। পরিচালকও মানুষটিকে চেনেন এবং অভিনেতাদের সাহায্য করেন চরিত্রটিকে জানতে। অভিনেতা তার অভিনয়ে চরিত্রটিকে নকল করে, যাতে দর্শকরা সেই মানুষটিকে চিনতে পারে।

প্রসেনিয়াম মঞ্চ এধরণের থিয়েটারের পক্ষে খুবই কার্যকরী। দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব, মঞ্চ ও দর্শকাসনের মধ্যেকার ব্যবধানকে কাজে লাগিয়ে যে কেউই বাস্তবের কাঙ্ক্ষিত ইলিউশন সৃষ্টি করতে পারেন। মঞ্চের আলো নকল দৃশ্যকে আসল বলে চালাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই জাদুকর, ইলিউশনিস্ট বলেই যাদের খ্যাতি, সবসময়ই প্রসেনিয়াম মঞ্চ পছন্দ করেন।

অসংখ্য প্রশ্ন উঠে আসছে। কতদূর পর্যন্ত এই ইলিউশন সৃষ্টি করা যেতে পারে? সত্যিই কি দর্শক ভুলে যায় যে এটা একটা মঞ্চ,ভুলে যায়, ওর ওপরে যারা রয়েছে তারা অভিনেতা? যত ইলিউশনই সৃষ্টি করা হোক না কেন এর মধ্যে কতটা দর্শকের স্বেচ্ছা-কল্পনা আর কতখানি বা সে যা দেখছে বা শুনছে তার ফসল? থিয়েটারের এক অলিখিত নিয়মকে মান্যতা দিতে দর্শকরা কি বিভ্রান্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই আসছেন না?

এখন হাজির এক নতুন শিল্পমাধ্যম — সিনেমা। বিভ্রম সৃষ্টির ক্ষেত্রে থিয়েটার কি সত্যিই সিনেমার সাথে প্রতিযোগিতা করে পারবে? নিশ্চিত উত্তর — কখনোই না। সিনেমার ছবি তো বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, যেখানে একটা বরফ ঢাকা পাহাড়, একটা ফেনায়িত সমুদ্র, একটা কর্মব্যস্ত শহরের রাস্তার ছবি সহজেই দেখানো যায়। এমনকি স্টুডিওর সেটগুলোও সত্যি বলে মনে হয়। কারণ ওগুলো বানাতে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। ক্যামেরা বহু ত্রুটিকে ঢাকা দিতে পারে, খুঁটিনাটি অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোকে বাদ দিতে পারে। এমন অবস্থায় দর্শকদের কল্পনার ওপর বেশি নির্ভর করাটা কি বেশি ভাল নয়? অন্তত নাটকের দৃশ্য তৈরির ব্যাপারে? কেন নয়? উদাহরণ দিই,দরজা বোঝাতে একটা আস্ত দেওয়ালের সাথে আটকানো একটা আস্ত দরজাকে দেখানোর কোনো দরকার নেই,একটা দরজার ফ্রেমকে আলগাভাবে ঝুলিয়ে

রেখে দিলেই হল। আজকাল ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারে এই ধরণের ব্যাপারস্যাপার অনেকটাই বেড়েছে।

কিন্তু একবার যদি কেউ বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, তখন সেটা আর শুধুমাত্র সেটের গণ্ডিতে আটকে থাকে না। সে গল্পের বাইরে, চরিত্রের বাইরে এবং সর্বোপরি ন্যাচারালিজমের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। একজন নাট্যকার খুব ভালভাবে বুঝতে পারে যে সে যা বলতে চায়, একটা গল্পের মধ্য দিয়ে, সেই গল্পের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার সবটা কার্যকরভাবে বলা সম্ভব না। একটা চরিত্র তার নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সীমাবদ্ধ, একটা গল্প এতটাই গণ্ডিবদ্ধ যে তা দিয়ে সে তার বিষয়কে বর্ণনা করতে পারে না। ধরা যাক, সে তার মতো শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজনের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চায়। নিঃসন্দেহে এই শ্রেণিটা সমাজে সংখ্যালঘু হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাছাড়া সে এই ধরণের মানুষদের খুবই কাছ থেকে চেনে। হতে পারে, সে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমস্যার থেকে এই বিশেষ শ্রেণির মানুষদের সাধারণ সমস্যাগুলো নিয়ে বেশি চিন্তিত। এই কারণেই সে একটি চরিত্রের বদলে বেছে নেয় এদের প্রটোটাইপ। এই বেছে নেওয়াটাই বুঝিয়ে দেয়, সমস্যাটা ব্যক্তিবিশেষের নয়, বরং অনেকের। এই সাধারণত্বে জোর দিতে সে ব্যবহার করতেই পারে চারটে প্রটোটাইপ, চারটে অন্তমিলযুক্ত নাম — অমল-বিমল-কমল-নির্মল, দিতে পারে একটা অন্য নামও, ধরা যাক, ইন্দ্রজিৎ। উদ্দেশ্য, ইন্দ্রজিৎ অন্য তিনজনের থেকে আলাদা, এটা বোঝানো। যদিও ইন্দ্রজিৎও একটা প্রটোটাইপ — কোনো চরিত্র নয়। ইন্দ্রজিতের সঙ্কটকে কার্যকররূপে ব্যক্ত করার জন্য সে কাউকে আমদানি করতেই পারে, যে চরিত্র বা প্রটোটাইপ নয়, বরং ইন্দ্রজিতের 'অল্টার ইগো' বা বিকল্প সত্ত্বা। গল্প সুনির্দিষ্ট,

তাই গল্পের পক্ষে সমস্যার সার্বজনীনতা ধরা মুশকিল। সে কারণেই জীবনের গল্প ছেড়ে সে বেছে নেয় চক্রাকারে ঘুরতে থাকাতাদের জীবনের কিছু 'বিশেষ' ঘটনা — পরীক্ষা, চাকরির ইন্টারভিউ, বিয়ে, কেরিয়ার। এটা করতেই থিয়েটারে এক নতুন ভাষার খোঁজ শুরু হয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি সে সেই মৌলিক প্রশ্নটার সামনে এসে দাঁড়ায় — থিয়েটার কি?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য প্রথমেই সে অনুভব করে যে, এর বেশ কিছুটা ইতিমধ্যেই তার জানা, কিন্তু কখনোই এর পুরো মানেটাসে বুঝে উঠতে পারেনি। থিয়েটার একটা জীবন্ত প্রদর্শনী, এটা বাস্তব। থিয়েটার বস্তুটা কখনোই গড়ে উঠতে পারত না যদি না মানুষের দুটি দল, অভিনেতা এবং দর্শক একই স্থানে, একই সময়ে, একই দিনে কিছু সময়ের জন্য জড়ো হতো, কিছুটা সময় একসাথে কাটাত। অভিনয় জিনিসটা হল, প্রথমত, 'এখন এইখানে', নাটকের গল্প বা ভাবনাটা পরে সেখানে থাকতেও পারে।

যে মুহূর্তে সে এটা অনুধাবন করে, তার চোখেদর্শক এক নতুন গুরুত্ব নিয়ে ধরা পড়ে। সে নিজেকেই প্রশ্ন করে, তাহলে আমরা কি দর্শকদের দূরে ঠেলে রাখতে পারি? তাদের রাখতে পারি আলাদা তলে? অন্ধকারে? তারা আমাদের সাথে মিলিত হবে না? তারা কি থিয়েটারে ঘটে যাওয়া ঘটনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়? এইসব প্রশ্নের আলোয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের স্থাপত্যর সবকিছুই ভুল বলে মনে হয়। দর্শকদের একদিকে রাখার অর্থ, শেষ সারির মানুষগুলোকে বহু দূরে ঠেলে দেওয়া। কেন তাদের চারদিকে বসানো হবে না? মঞ্চের উঁচু বেদীটা অভিনেতাদের উঁচুতে রাখে আর বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেন তারা দর্শকদের একই তলে নেমে আসবে না? অন্ধকারে ঢাকা পড়া দর্শকদের কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া অভিনেতাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

ঠিক একইভাবে দর্শকদের পক্ষেও তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জানা অসম্ভব। কেন তাদের একই আলোর বৃত্তে রাখা হবে না, যাতে আমরা তাদের দেখতে পাই এবং তারাও একে অপরকে দেখতে পায়? দর্শকদের প্রত্যেককেই একটা নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় এবং ছবির ফ্রেমের পিছনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দ্বিমাত্রিক ইমেজ হিসাবেই রয়ে যায়। কেন একটা একই জায়গায় দর্শকদের নিয়ে একটা ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা তৈরি করা যাবে না? বস্তুত এটাই তো থিয়েটার।

থিয়েটার জীবন্ত। থিয়েটারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব। এটাই থিয়েটারের শক্তি। ঠিক এখানেই সিনেমা কখনো থিয়েটারের সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। থিয়েটার হচ্ছে দুধরণের মানুষের যোগাযোগের জায়গা। সেখানে তাদের মধ্যে একটা কিছু ঘটে — একটা 'হিউম্যান অ্যাক্ট'। থিয়েটার 'হিউম্যান ইভেন্ট', সিনেমা সেটা নয়।

এটা বলা হয় যে থিয়েটারের উৎস হল রিচ্যুয়াল বা শাস্ত্রাচার। রিচ্যুয়াল একটা নাটক যাতে সমগ্র জনগোষ্ঠী সামিল হয়। সে নাটকটা লেখার আকারে নেই, কিন্তু সম্প্রদায়ের সবাইয়েরই জানা। স্কোর বা বিন্যাসটাও জানা। চরিত্রগুলো সবার মধ্যে প্রথা অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হয়। রিচ্যুয়ালে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সেখানে অভিনেতাদের জন্য থাকে বিশেষ কিছু চরিত্র — শমন, দীক্ষাগুরু বা গাইড, ট্রান্স ডান্সার, প্রধান পুরোহিত, বিশিষ্ট প্রবীণের দল। তাদের বিশেষ কিছু কাজ আছে, কথা আছে, আছে বিশেষ ধরণের পোশাক আশাক আর মেক আপ। এটা সত্যি যে, রিচ্যুয়ালগুলো মূলত ফললাভের আশায় করা হয় — প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিহত করা, বৃষ্টি আনা, উর্বরতা বৃদ্ধি, শৈশব থেকে যৌবনে বা একা থেকে বিবাহিত জীবনে পা দেওয়ার মুহূর্তে মঙ্গলকামনা এইসব। তবু এর সাথে সাথে

রিচুয়াল বিনোদনও বটে। সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য আনন্দ-উৎসবের উপাদানও এর মধ্যে থাকে। যেহেতু থিয়েটার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই থিয়েটারও ফলাফল নির্ভর হতে পারে। এই ধরণের থিয়েটার তার দর্শকদের ভাবনা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে চায়, কোনো এক কাজে অনুপ্রাণিত করতে চায়। ফলের আকাঙ্ক্ষা আর বিনোদনকে একই সুতোয় বাঁধার কারণে থিয়েটার রিচুয়ালের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দর্শকদের আরো বেশি অংশগ্রহণ কি জরুরি নয়? নাটকের সমস্ত কার্যকলাপকে আমরা কি শুধু নিজেদের কুক্ষিগত করে আর প্রথাগত শহুরে থিয়েটারের মতো দর্শকদের নিষ্ক্রিয় করে রাখব? নাটকের মধ্যে তাদের আরো একটু বেশি জড়িয়ে নেওয়ার কি কোনো উপায় নেই? তাদের কি আরো একটু বেশি অংশীদার করে নেওয়া যায় না, রিচুয়ালে যেমন হয়?

থিয়েটারে যোগাযোগের উপায় চারটি। অভিনেতার সাথে দর্শক, অভিনেতার সাথে অভিনেতা, দর্শকের সাথে অভিনেতা এবং দর্শকের সাথে দর্শক। এর মধ্যে প্রথম দুটি উপায় আমাদের সবার কাছেই পরিষ্কার। অভিনেতারা সবসময়ই দর্শকের সামনে হাজির থাকে, এর জন্যই তো থিয়েটার। অভিনেতারা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রাখে, কেননা নাটকের চরিত্র হিসাবে তারা একে অপরের সাথে যুক্ত, এমনকি যখন কোনো গল্প বা চরিত্রও থাকে না, তখনও তারা একটা দল হিসাবেই কাজ করে। কাজে ও কথায় এরা একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু যেই আমরা সংযোগের অন্য দুটি উপায়ের কথা আলোচনা করব, তখনই সেটা ভয়ানক হয়ে উঠবে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার বা দর্শকের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ মানেই আমরা ধরে নিই, গোলমাল বাঁধবে। হ্যাঁ, বাঁধবে, যদি আমরা ধরে নিই, যোগাযোগের উপায় একমাত্র

ভাষাতেই সীমাবদ্ধ। দর্শকের একাগ্রতা, মনোযোগ, নাটক দেখার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় তার মুখের অভিব্যক্তি বা তার শরীরী উত্তেজনায়। এ সবই অভিনেতার কাছে বা অন্য দর্শকের কাছে ফিডব্যাক হতে পারে। যে মুহূর্তে অভিনেতা দর্শকের কাছে এসে গিয়েছে, তাকে এক আলোকবৃত্তে জায়গা দিয়ে তার উপস্থিতিকে দিয়েছে স্বীকৃতি, তখনই থিয়েটারে দর্শকের স্বেচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন করা ও তার সম্ভাব্য উত্তর খোঁজার কাজটা শুধুমাত্র ভাবনায় সীমাবদ্ধ থাকে না। যেহেতু লোকটা থিয়েটারে সর্বক্ষণ সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তাই সে তার বহু প্রশ্নের উত্তর তার থিয়েটারের মধ্য থেকেই, এমনকি শহুরে থিয়েটারের চৌহদ্দির মধ্যেও খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তার নাটক লেখার ভাষা, তার পরিচালিত, অভিনীত থিয়েটারের ভাষা বদলে যেতে থাকে।

যখন সে বুঝতে পারে, থিয়েটার একটা জীবন্ত মাধ্যম, তখন থেকে স্বাভাবিকভাবেই সে বেশি বেশি করে মানুষের ওপর — অভিনেতা ও দর্শকের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। আর এই নির্ভরতা তাকে আরো ভাবনা ভাবিয়ে দেয় — থিয়েটারের মূল হাতিয়ার হল মানুষের শরীর। ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসায় তার এই নতুন উপলব্ধি আরও দৃঢ় হয়। প্রথাগত শহুরে থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ — সেট, প্রপস্, স্পট-লাইট, পোশাক, মেক আপ — এগুলো সত্যি সত্যিই কি অপরিহার্য? তারা সহায়ক হতে পারে, কোনো ধরণের থিয়েটারে তারা প্রয়োজনীয়ও হতে পারে, কিন্তু এগুলো বা এগুলোর মধ্যে একটাও কি থিয়েটারের অপরিহার্য হাতিয়ার হতে পারে? অন্যভাবে বলা যায়, এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা বা ধরা যাক, সবকটাই যদি থিয়েটার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে থিয়েটার আর থিয়েটার থাকবে না? কিন্তু মানুষের শরীরকে বাদ

দিয়ে, মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া থিয়েটার বাঁচতে পারে না।

এসব কারণে প্রসেনিয়াম থিয়েটারেও সেট, প্রপস্, পোশাক, মেক আপ, আলো ইত্যাদির গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে এসেছে এবং অন্যদিকে অভিনেতাদের শরীরের উপর নির্ভরতা গিয়েছে বেড়ে। এর সাথে তাল রেখে তার নাটক লেখার ভাষাও বদলে যাচ্ছে, যদিও তখনও অব্দি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কথা মাথায় রেখেই তার নাটক লেখা চলছে। এমনকি যখন সে একটা নাটক লেখে যাতে একটা গল্প আছে, চরিত্রগুলো ন্যাচারালিস্টিক সংলাপ বলছে, তখনও নাটকের এমন এক কাঠামো সে তৈরি করে, যা ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটার থেকে বহুদূরে। সময়ের ধারাবাহিকতা এবং স্থানের পার্থক্যকে এখানে গ্রাহ্য করা হয় না। নাটকের ঘটনা এক সময় থেকে অন্য সময়ে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সেট বা প্রপসের বদল ছাড়াই বিরতিহীন বয়ে চলে। এমনকি একই মঞ্চে দুই বা ততোধিক স্পেস-এ এবং সময়ে ঘটে চলা ঘটনা একই সাথে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে স্পেস ছড়িয়ে পড়ে এবং সময় হয়ে যায় দূরবীক্ষণিক। সেট, প্রপস্-এর ধারণাটুকু শুধু দেওয়া হয়, সবটা বাস্তবে দেখানো হয় না। তাই বাস্তবতার তোয়াক্কা না করে নাটকের ঘটনা, অ্যাকশনও হয়ে ওঠে ধারণানির্ভর, বিমূর্ত ভঙ্গি, মুভমেন্ট, যেন শরীরের শক্তি আর শব্দশক্তির বিপুল বিষ্ফোরণ। লোকটা এসব করতে পারে, কারণ মানুষের উপর তার নির্ভরতা গিয়েছে বেড়ে। তার এক হাতে রয়েছে অভিনেতাদের শরীর আর অন্য হাতে দর্শকের কল্পনাশক্তি।

পরিবর্তনের এই জাদু যদি সত্যিই কার্যকর হয়, তবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে পুরোপুরি ছেড়ে আসাটাই তার চরম সিদ্ধান্ত হবে, এ আর আশ্চর্য কি? তার মতো একজন শহুরে মানুষ যে এতকাল ধরে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে মেনে নিয়েছিল, তার পক্ষে এই পদক্ষেপ বেশ অসুবিধাজনক তো বটেই। কিন্তু

যে মুহূর্তে সে এই পথটা বেছে নিল, তার থিয়েটারের ভাষা দ্রুত বদলে যেতে লাগল। এতদিন ধরে তার চিন্তা ও কাজের মধ্যে যে সব ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো ঘটছিল এখন সেগুলো এক রকমের সংহতি পেল।

শেষ পর্যন্ত সত্তর দশকের গোড়ায় সে ঐ নতুন থিয়েটারেই পা রাখল, আর এখন সে তার সেই পছন্দের থিয়েটারকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে।

একটা বড়োসড় ঘর, কিন্তু হাজার বর্গফুটের বেশি নয়। দর্শকের বসার জন্য রইল তিনটি পৃথক উচ্চতায় হাতল ছাড়া, পিছনে হেলান দেওয়ার জায়গা ছাড়া বেঞ্চ। কোনোটা নিচু, কোনোটা মাঝারি, কোনোটা বা টেবিলের মত উঁচু। এতে সবার জন্যই স্পষ্ট দেখার ব্যবস্থা করা গেল। ঘরটা যে মাপের, তাতে কোনোদিকেই তিনটের বেশি সারি বসানো সম্ভব না। প্রতি বেঞ্চে দুজন করে বসানো যাবে। কিন্তু যেহেতু হাতল নেই, একটা বেঞ্চের সাথে আর একটা বেঞ্চকে জুড়ে দিয়ে একটা অনেক লম্বা সমান জায়গা পাওয়া সম্ভব। একলা একটা চেয়ারে বসার চেয়ে এইভাবে বসলে দর্শক থিয়েটারের সাথে নিজেকে আরো একাত্ম করে তুলতে পারবে। প্রত্যেকটা আলাদা নাটকের জন্য বসার জায়গা আলাদা আলাদাভাবে সাজানো হয়, তাতে দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে সম্পর্কের ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা অনেকখানি বেড়ে যায়। এখানে আলাদা মঞ্চ নেই, অভিনয় হয় ঘরের মেঝেতে। মানে, অভিনেতা ও দর্শক রয়েছে একই পরিবেশের মধ্যে। আলোর জন্য একশো ওয়াট বা তার কম পাওয়ারের সাধারণ ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়, যদিও যথেষ্ট সংখ্যক আলোর উৎসের ব্যবস্থা রাখা হয়। একটা সাধারণ কিন্তু কার্যকরী ওয়্যারিং-এর মাধ্যমে কিছু সুইচের ব্যবস্থা রাখা হয়, যেগুলোর সাথে বিভিন্ন কম্বিনেশনে আলোর উৎসগুলিকে যুক্ত করা, ল্যাম্পশেডগুলো পাকাপাকিভাবে

ক্লাম্পের সাথে আটকানো। এর ফলে অভিনয়ক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গাকে ইচ্ছেমতো আলোকিত করা যায় এবং আলোকে ছোট করে যে কোনো দিকে ফেলা যায়। ডিমার ব্যবহার হয় না, ঘরের ভেতর শুধুমাত্র একটা সাধারণ সুইচ-বোর্ডই যথেষ্ট।

এই হচ্ছে একটা ইন্টিমেট বা অন্তরঙ্গ থিয়েটার। অভিনেতারা দর্শকদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে যেতে পারে, কানে কানে কথা বলতে পারে, এমনকি ইচ্ছে হলে ছুঁতেও পারে। অভিনয় দর্শকের সামনেও হতে পারে, পেছনেও হতে পারে বা পাশে। একটা ভুল ধারণা হল, প্রত্যেকটা দর্শক নাটকের সবটা সবসময় দেখতে পাবে, তাতে যদি দুশো ফুট দূর থেকেও দেখতে হয়, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এই ভাবনাটা বাতিল করা হয়েছে। এই থিয়েটারের ভাষা বলে, 'অনুভব করো, অন্তর্গত হও', নিভৃত বিচ্ছিন্ন দূরত্ব থেকে শুধু দেখা আর শোনার জন্য এ নাটক নয়। এর মধ্যে রয়েছে আর একটা মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরার কথা, তার প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা, এক্ষুনি এইখানে। এটা নয় যে একদল অন্ধকারে ঢাকা পড়া মানুষের সামনে নাটক দেখানো আর সামনের ভিড়টা যে মানুষেরই, সে সম্বন্ধে উদাসীনতার ভান করা।

'অভিজ্ঞতা' — সব শিল্পেরই একটা জরুরি কথা। একমাত্র না হলেও শিল্পের আবেদন প্রধানত উৎসারিত হয় আবেগ থেকে — বুদ্ধি থেকে নয়। উপন্যাসের কাজ একজন পাঠককে শুধুমাত্র একটা গল্প বলে যাওয়া নয়, তার হৃদয়ে যে অনুভূতি, একাত্মতা জেগেছে, তাই দিয়ে একটা নতুন জগৎ তৈরি করা। একটা ভাল ছবি শুধুমাত্র একটা দৃশ্য বা ঘটনাকে চিত্রিত করে না বরং দর্শককে হৃদয়ের কাছে নাড়িয়ে দেয়। একইভাবে থিয়েটারের ভাষাতেও কি এই প্রয়োগ সম্ভব নয়?

'অনুভবে যোগাযোগ', 'নাট্য অভিজ্ঞতা'—এই শব্দগুলো নতুন থিয়েটারে কিভাবে প্রযুক্ত হবে?

নতুন থিয়েটারের কাছে দর্শকরা বাস্তবের ইলিউশন দাবি করে না। তারা দাবি করে বাস্তবকে, অভিনেতাদের বাস্তব উপস্থিতিকে। এই থিয়েটারে শুধুমাত্র অভিনেতা এবং দর্শকের মধ্যেকার স্পেসটা বদলে গেল, তাই নয়, বরং এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল, দুটি মানুষ হিসাবে তারা নিজেদের এক গভীর সম্পর্কে বেঁধে ফেলল, যা অভিনয়ের ভাষাকেই দিল বদলে। প্রথাগত ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারে অভিনেতারা সাজ-পোশাক, মেক আপ, ভাবভঙ্গি, মুভমেন্ট, জেসচার, মুখের অভিব্যক্তি, ম্যানারিজম — এসব চরিত্রানুযায়ী নকল করে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে, ছোট করে বললে, মিথ্যার মাধ্যমে, নিজেদের পরিচয়কে নাটকের চরিত্রে বদলে নেয়। সাধারণত একেই বলা হয় 'অভিনয়'। কিন্তু নতুন থিয়েটারে অভিনেতারা নেমে আসে, কাছে আসে, সে যেমন মানুষ, ঠিক তেমনিভাবেই আর এক 'মানুষ' দর্শকের কাছে ধরা দেয়। এখন সে আর মিথ্যাতে নেই, এখন সে মুখোস খুলে ফেলেছে, হয়ে উঠেছে, সে যা, তাই।

আমাদের এই সভ্যতায়, আমাদের এই সময়ে একজন মানুষের পক্ষে, সে যা, তাই, এটা প্রকাশ করা খুবই দুরূহ কাজ। তথাকথিত সভ্য মানুষ একদম ছোটবেলা থেকে মুখোস পরে থাকতে শেখে। 'এটা করো', ওটা কোরো না', 'ঠিকমত আচরণ করো'— গোটা ছোটোবেলা জুড়ে তাকে এই কথাই বলা হয়। যখন সে বড় হয় তখন সে নিজেই নিজেকে এসব বলতে থাকে। তার আচার-আচরণ, চাল-চলন, মুখের অভিব্যক্তি, ভাবভঙ্গি, তার কথা বলা — সব কিছুই হয়ে যায় কৃত্রিম এবং শর্তাধীন। অন্যদের কাছে সে যা হাজির করে সেটা তার সত্যিকারের সত্তা নয়। একটা বাইরের চেহারা, একটা ছদ্মবেশ তাকে এই প্রতিযোগিতানির্ভর

অমানবিক পৃথিবীতে রক্ষা করে, বাঁচতে সাহায্য করে। যে কোনো কিছু প্রকাশ করার জন্য তার শরীরের কিছু অংশমাত্র সে ব্যবহার করে, এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সেটুকুই তার কাছে 'যথেষ্ট', যা তার 'আমি'র সামান্য অংশ, যা সে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়। কারণ সভ্যতার নিয়ম হল, গোপন করা, প্রকাশ করা নয়। যাকে আমরা ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটার বলি, সেখানে অভিনেতারা ওই একই পরিস্থিতির শিকার এমন আরেকজনের সেই অস্বাভাবিক ভীষণরকম কৃত্রিম আচরণ, কথা বলার কায়দা নকল করে। মানে সে নিজের মুখোসটা খুলে ফেলে অন্য কারোরটা পরে নেয়।

তাই নতুন থিয়েটারের দাবি, সব অর্থে অভিনেতার এক নতুন ভাষা। অভিনেতাকে নিজের মুখোসটা খুলে ফেলে নিজের উলঙ্গ 'আমি'টাকে প্রকাশ্যে আনতে হবে। 'সভ্য' জগতে থিয়েটারই সম্ভবত সেই একমাত্র বারোয়ারি জায়গা, যেখানে এটা করা সম্ভব। এখন অভিনেতাদের কাজ হল, এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো। সাথে সাথে কাজটা বেশ ঝুঁকিরও, কারণ, মুখোসহীন ও বর্মহীন সে নিতান্তই অরক্ষিত, অসহায়। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে হবে, কারণ, দর্শককে মুখোস খুলতে বলার এটাই একমাত্র পথ। এটা ঘটলেই থিয়েটার হয়ে উঠবে একটা সত্যিকার মানুষের ঘটনা, হয়ে উঠবে মানুষের সত্যিকারের মিলনক্ষেত্র, মুখোসের সাথে মুখোসের নয়, বর্মের সাথে বর্মের নয়, মানুষের সাথে মানুষের।

কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে ইনটালেক্ট বা প্রজ্ঞাকে কোনোভাবেই খাটো করা হচ্ছে না। প্রজ্ঞার পথেই জ্ঞান অর্জন করা যায় আর জ্ঞান ভীষণভাবে দরকারি। কিন্তু অনুভূতিহীন জ্ঞান গোঁড়ামির জন্ম দেয়, ঠিক যেমন জ্ঞানহীন আবেগ একজনকে বস্তুজগতের বাইরে ঠেলে দেয়, হয়তো পাঠিয়ে দেয় পাহাড়ের চুড়োয় ধ্যান করতে। সংবেদন ও জ্ঞানের সংহতিকেই বলা যেতে পারে চৈতন্য। এই

চেতনাই কোনো অর্থবহ কাজকে পরিচালিত করতে, এগিয়ে নিয়ে যেতেপারে। এটাই পৃথিবীকে আরো ভালোর দিকে বদলে দিতে পারে। আমরা জানি, এই পৃথিবীতে মানুষ অনাহারে মরছে, জেলখানার ভেতর মানুষের উপর চলছে অত্যাচার। আমরা জানি, এক মিনিটের ভগ্নাংশে পৃথিবী নামক এই গ্রহটা জমানো পারমাণবিক অস্ত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এসবই হল জ্ঞান। কিন্তু আমরা এসব ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নিতে পারব না, যদি না আমরা এই সমস্ত জ্ঞানের গুরুত্বকে অনুভব করতে পারি।

আসুন, যে মানুষটাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি, তার সচেতনতার দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাই। এখন সে বুঝতে পারছে, তার বদলে যাওয়া থিয়েটারের ভাষা তাকে দিয়েছে মানুষের সাথে মানুষের, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগের অনুভূতি। মাঝে মাঝে প্রসেনিয়াম থিয়েটারেও এটা করা যায়, তা সে অস্বীকার করে না। কিন্তু একজন অভিনেতা এবং একজন দর্শক হিসাবে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে বলে, বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে, বহু বাধা ডিঙিয়ে এই সংযোগটা তৈরি হয়। থিয়েটার-উত্তর থিয়েটার, অভিনয়-উত্তর অভিনেতাই পারে এমন ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে। এই নতুন থিয়েটারে সে একটা স্বাধীনতা অনুভব করে, যা সে আগে কখনো প্রসেনিয়াম থিয়েটারে পায়নি।

আর একটা উপলব্ধি তার হয়েছে, যেটা তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে দেখেছে, দামি মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র, যেমন, সেট, প্রপস্, স্পটলাইট, পোশাক ইত্যাদি বর্জন করে শুধুমাত্র মানুষের শরীরের ওপর নির্ভর করার ফলে সে তার থিয়েটারকে টাকাপয়সার উপর বিচ্ছিরিরকম নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। বেচাকেনার উপর নির্ভরশীল একটা সমাজে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিল্পও একটা পণ্যে

পরিণত হয়েছে, যেটা কেনা বা বেচা যায়। এতদিন পর্যন্ত সেও এই শর্তটা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। এখন একটা 'ফ্রি থিয়েটার' সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভাবনা,একদম গোড়ায় সে নিজেকে যে প্রশ্নগুলো করেছিল, তার প্রথম প্রশ্নটার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে —ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে থিয়েটার কি? তাই আসুন, আমরা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটার একদম গোড়ায় ফিরে যাই এবং গোটা প্রক্রিয়াটাকে একটা অন্য আলোয় দেখি।

যদিও কিছুটা ভাসা ভাসা, তবু একদম প্রথম থেকেই সে জানত, সে যে থিয়েটারকে বেছে নিয়েছে সেটাই ভারতবর্ষের একমাত্র থিয়েটার নয়। এমনকি দর্শক সমাগমের প্রশ্নে তেমন প্রভাবশালী বা জনপ্রিয়ও নয়। এমনকি এই থিয়েটারের জন্মটাও এদেশে নয়। এদেশে বহু বিচিত্র থিয়েটার রয়েছে, যাদের একত্রে 'লোকনাট্য' বা 'ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার' বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বিভিন্ন নাম; বাংলায় 'যাত্রা', মহারাষ্ট্রে 'তামাশা', উত্তরপ্রদেশে 'নৌটঙ্কি', গুজরাটে 'ভাওয়াই', কেরালায় 'কথাকলি', কর্নাটকে 'ইয়াকসগনা' ইত্যাদি আরো আরো। তাহলে দেখা গেল, ভারতবর্ষে একটিমাত্র থিয়েটার নেই, তবে রয়েছে স্পষ্ট দুটি ধারার থিয়েটার। প্রথমটি দেশীয়, প্রধানত গ্রামীন, আর অন্যটি পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে প্রায় এক শতাব্দীর কিছু আগে আমদানিকৃত। এমনকি আমরা যদি বলিও এটা ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করে ফেলেছে, তবু এখনোএটা প্রথমটার থেকে ভীষণভাবে আলাদা, মূলত শহরাঞ্চলে আবদ্ধ। একশো বছরের বেশি সময় ধরে এই দুই থিয়েটার কোনোরকম মিলন এবং উল্লেখযোগ্য আদানপ্রদান ছাড়াই সমান্তরালভাবে চলেছে।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শহর ও গ্রাম জীবনের মধ্যে একটা দুর্ভাগ্যজনক বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যটা শুধুমাত্র

অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য, পরিষেবার সুযোগ, শিক্ষার মান, সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং এইরকম নানা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আরো বেশি মৌলিক। এর শেকড়টা রয়েছে সেই ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে, এত দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষের উপনিবেশ হিসাবে থেকে যাওয়া। ভারতবর্ষের আধুনিক শহরগুলো সামগ্রিক বিচারে দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় থেকে গড়ে ওঠেনি, বরং এখানে শহর গড়ে তোলার এবং তাকে উন্নত করার পেছনে মূলগতভাবে বিদেশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করাটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, ঠিক যেমনটা হয়েছিল পশ্চিমের স্বাধীন দেশগুলোতে। এই ধরণের শহরগুলো তৈরি হয়েছিল গ্রামাঞ্চলকে শোষণের জন্য, তাদের উন্নয়নে সহায়ক হবার জন্য নয়। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রথম পর্বে ভারতবর্ষের কুটির শিল্পে উৎপাদিত উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খুব কম দামে কিনে নিত এবং তার দামটা মেটাত ভারতীয়দের ওপর চাপানো করের থেকে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মতো শহরগুলো তৈরি হয়েছিল এইসব পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও তাদের ইউরোপে রপ্তানি করার কেন্দ্র হিসাবে। এই ধরণের শোষণ থেকে উদ্ভূত সঞ্চিত পুঁজিই ব্রিটেনকে তার শিল্পবিপ্লব সফল করতে সক্ষম করেছিল। এরপর শুধুমাত্র ভারতীয় পণ্য ব্রিটেনে আমদানি করার জন্যই নয়, বরং ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্য ভারতবর্ষে বিক্রি করাটাও তার স্বার্থ ছিল। এর জন্য প্রথমেই ভারতের কুটির শিল্প, যা ব্রিটেনের শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নামছিল, সেগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষকে একটা পশ্চাদ্‌পদ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হয়েছিল, যাতে সেটি একদিকে ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের এক বিশাল বাজারে পরিণত হয় ও অন্যদিকে সে যাতে ব্রিটেনকে তার শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী হয়। এই সব লক্ষ্য পূরণের কার্যকরী উপায় হিসাবে 'জমিদারী ব্যবস্থা'র পত্তন করা হয়েছিল। এই পর্বে

ভারতবর্ষের শহর এবং বন্দরগুলো বিদেশি শোষণের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য আরো বেশি মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। আক্ষরিক অর্থে, গ্রামাঞ্চলের ক্ষতির বিনিময়ে শহরগুলো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক জগতেও এই বৈপরীত্যের প্রভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই এই সুবিধাটা প্রথমে শহরেই দেওয়া হয়। প্রথমে যারা এই ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করেছিল, হয় তারা জমিদারি ব্যবস্থার কল্যাণে গড়ে ওঠা জমিদার পরিবারগুলোর সদস্য, না হয় ব্যবসায়ী, দালাল, কুসীদজীবী ইত্যাদি, যারা ঔপনিবেশিক শোষণের হাত ধরে সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে শহুরে সংস্কৃতির মূলটা প্রোথিত রয়ে গেল পশ্চিমের মাটিতে এবং যার সাথে দেশীয় ঐতিহ্য অনুসারী সংস্কৃতির এক স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হল। এর ফলে অবশ্য গ্রামীন সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটেনি, বরং দুটি সংস্কৃতিই সমান্তরালভাবে বহমান রইল। এভাবেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গ্রাম-শহরের বৈপরীত্যটা প্রসারিত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের গ্রামে ও শহরে দুটো ভিন্ন ধারার থিয়েটার থাকবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই ভারতবর্ষের শহুরে থিয়েটারটা গ্রামীন পরিমন্ডলে চালু ঐতিহ্যবাহী থিয়েটারের ধারাবাহিকতায় আসেনি। এটা একটা ভিন্ন জাতের থিয়েটার, যেটাকে ব্রিটেন থেকে আমদানি করা হয়েছে। এই থিয়েটার যে সব আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তার শিকড়টা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন থিয়েটার তার দেশীয় বিষয় ও আঙ্গিক বজায় রেখেছে।

এই ধরণের অবস্থার নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো কি? মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে আর্থ-সামাজিক মুক্তির যে প্রচেষ্টা, ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে পশ্চিমের দুনিয়া থেকে এগিয়ে থাকা প্রগতিশীল যে সব চিন্তাভাবনা এসেছিল, তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সমস্ত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছিল এবং লালনপালন করেছিল প্রধানত শহুরে বুদ্ধিজীবীর দল, যাদের আবার টিকিটা বাঁধা ছিল সামন্ততন্ত্র এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে। ফলত, ঐসব চিন্তাভাবনা আটকে রইল সামাজিক ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডিতে, শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অথবা কোনো বিমূর্ত স্তরে। অথচ প্রগতিশীল কর্মকান্ডের সাথে এইসব চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে নিশ্চিতভাবেই তা সারা দেশকে প্লাবিত করত। কিন্তু তা হল না। অন্যদিকে গ্রামের সাধারণ মানুষের চিরকালই মুক্তির প্রয়োজন। কেননা সেখানকার চিন্তাচেতনার স্তরটা তখনও প্রথাগত সামন্ততান্ত্রিক ঘেরাটোপে আটকা পড়েছিল। গ্রামাঞ্চলে লোকনাট্যের প্রবল জনপ্রিয়তা, অথচ এর মধ্যে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের চর্চা হত, সেগুলো অধিকাংশই পিছিয়ে পড়া, বন্ধ্যা, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলও, কিন্তু কোনোভাবেই সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির সমস্যার সাথে যুক্ত নয়। অন্যদিকে শহুরে থিয়েটার পরিশীলিত দর্শকের সামনে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের প্রচার চালাতে পারে, সেই দর্শক মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠলেও সেই অনুযায়ী কাজ করে না বা করতে পারে না।

প্রথাগত নাগরিক থিয়েটারের মধ্যে আটকে থেকে কাজ করতে করতে লোকটার মাথায় ভারতবর্ষের নাটকের পরিস্থিতি নিয়ে এই কথাগুলোই তৈরি হতে থাকে। থিয়েটারের মাধ্যমে কি করে আরো বেশি কাছে পৌঁছন যায়, তাই নতুন ভাষা খুঁজতে খুঁজতে সে চেয়েছিল ঐ বৈপরীত্যটা নিয়েও একটা কিছু করতে।

এই চেষ্টা যতই অপর্যাপ্ত বা সীমাবদ্ধ হোক না কেন, তার খোঁজার মধ্যে ঢুকে গেল 'ফ্রি থিয়েটার' বা মুক্ত থিয়েটারের ভাবনা, যেটা শুধুমাত্র মধ্য ও উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এমনকি দেশের শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সাথে সম্পর্কহীন পিছিয়ে থাকা মূল্যবোধগুলোর সাথেও গাঁটছড়া বাঁধবে না। সে ক্রমশ বুঝতে পারল, এর জন্য প্রয়োজন একটা নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ থিয়েটার। প্রয়োজন একটা তৃতীয় থিয়েটারের, অন্ততপক্ষে আজ, এই সময়ের জন্য।

এত বছর যুক্ত থাকার পর যখন সে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ করল, পেয়ে গেল এক নতুন জীবন্ত শিল্পমাধ্যম আর তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করে সরাসরি যোগাযোগের একটা নতুন পথ, শুধু তাই না, উপরন্তু হাতের কাছে পেয়ে গেল এক নমনীয় বহনীয়সুলভ মুক্ত থিয়েটার বানানোর সমাধানসূত্র। এর কারণ, প্রসেনিয়াম থিয়েটারে একগাদা অপ্রয়োজনীয় দামি দামি জিনিসপত্র যোগাড় করতে টাকা লাগে, সেই টাকার উপর আর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে না। এখন তার থিয়েটার দুটো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এবং দুটো ভিন্ন দিকে এগোতে পারে। প্রথমত, এটা অন্তরঙ্গ থিয়েটার, যেখানে গভীর অনুভূতির সম্পর্ক সৃষ্টি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, যেখানে মানুষ রয়েছে, এই থিয়েটার সেখানেই পৌঁছে যেতে পারে। নীতিগতভাবে এই দু'ধরণের থিয়েটারই 'ফ্রি' হতে পারে, শুধুমাত্র 'মুক্ত' অর্থে নয়, 'মাগনা' অর্থেও, কেননা এই থিয়েটার মানুষের স্বেচ্ছাদানের উপর নির্ভর করে চলতে পারে, দর্শকের প্রবেশাধিকার টাকাপয়সার শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটা খুব জরুরি ব্যাপার। কারণ লোকটা বিশ্বাস করে, থিয়েটারকে অবশ্যই 'ফ্রি' হতে হবে, শুধুমাত্র এইজন্য নয় যে দেশের বেশিরভাগ মানুষের টিকিট কেনার সামর্থ্য নেই, বরং মুখ্যত

থিয়েটারের মতো একটা মানবিক কাজ যা মানুষকে সমমর্যাদার সাথে একে অপরকে মিলিত হবার বন্দোবস্ত করে দেয়, যাতে সেই মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও মানবিক হয়ে ওঠে। যখনই অর্থের প্রশ্নে প্রবেশ শর্তাধীন হয়ে যাবে, সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়াবে ক্রেতা-বিক্রেতার। হয়তো এই সমাজে এটাই সত্যি, কিন্তু আর যাই হোক, সেটা মানবিক সম্পর্ক নয়।

এভাবেই সে তার নাট্যচর্চা করতে লাগল। তার থিয়েটারের দল সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে কলকাতার একটি ঘরে অভিনয় করতে লাগল শুধুমাত্র মুখে মুখে প্রচারের ওপর নির্ভর করে। দর্শকদের কাছ থেকে এক টাকা করে অনুদান নেওয়া হল, যদিও সেটা প্রবেশের প্রাক্‌শর্ত নয়। এছাড়াও তার দল এখন আরো বিভিন্ন জায়গায় নাটক করে। যেমন, কোনো পার্কে বা গ্রামে, বস্তি অঞ্চলে, অফিস, কারখানা, কলেজের চাতাল, শহরতলির কোনো ফাঁকা জায়গায়।

যদিও নতুন থিয়েটারের দুটি ধারার দর্শনটা একই, তবু তাদের নিজস্ব ভাষা দু'টি অনেকটাই আলাদা। অন্তরঙ্গ থিয়েটারের পরিবেশ সৃষ্টি হয় দর্শকদের বসার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, দর্শক খুব কাছে, তাই ব্যক্তিগত সংযোগ সম্ভব, যোগাযোগের গভীরতা, অভিনয়ের সূক্ষ্মতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। কিন্তু একটা গ্রাম বা পার্কের মুক্তমঞ্চ, যেখানে মাঝেমধ্যে হাজার হাজার দর্শক সমবেত হয়, সেখানে এসব কিছু করা যায় না। কিন্তু এই ক্ষতিটা পুষিয়ে গিয়ে লাভই হয় বেশি। তার থিয়েটার এখন গ্রাম ও বস্তি অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের কাছে পৌঁছতে পারে, যাঁরা কখনোই কলকাতায় তার অন্তরঙ্গ থিয়েটার দেখতে আসবেন না। তাই সে এই দুটো থিয়েটারের কোনোটাকেই ছাড়তে চায় না। সেক্ষেত্রে দুটো ভাষারই উন্নতি করতে এবং সেই ভাষাগুলোয় দক্ষ হয়ে উঠতে অফুরন্ত পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের প্রটোটাইপ, সেই মানুষটা, এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার থিয়েটারের ভাষা গোড়া থেকে বদলে গেছে এবং এখনও বদলে চলেছে। ভাষা বদলেছে, তার কারণ এই নয় যে সে খালি বদলাবে বলে বদল চেয়েছিল। তার এই খোঁজাটা কখনোই নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা এই রকম কোনো ইচ্ছের ফসল নয়। সে কখনোই 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা 'থিয়েটারের জন্য থিয়েটার' এই ধরণের আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী নয়। পরিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটা একটা দর্শনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সে বিশ্বাস করে, নতুন ভাষাটা প্রতিষ্ঠা পাবে তখনই, যখন এটা একটা আন্দোলনের রূপ নেবে। যখন সে চারদিকে তাকায়, সে দেখতে পায়, ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই সেই আন্দোলনটা শুরু হয়েছে এবং তাতে গতি আসছে — কলকাতার শহরতলিতে, বাংলার ছোট ছোট শহরগুলোয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি কিছু কিছু গ্রামেও। কোনোভাবেই সে এই আন্দোলনের জনক নয়। আজকের সময়ের সমস্যা, আজকের দিনের প্রয়োজন দিকে দিকে মানুষকে তাদের থিয়েটারের ভাষাটা বদলে দেবার প্রেরণা দিয়েছে, ঠিক যেভাবে তার নিজের জীবনে ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে।

থিয়েটার নিজে নিজেই এই পৃথিবীটাকে আরো ভালোর দিকে বদলে দিতে পারবে না। কিন্তু পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায়, আসুন, আমরা থিয়েটারকে তার বিনম্র ভূমিকা পালন করতে দিই। আসুন, আমরা প্রত্যাশা রাখি, থিয়েটারের ভাষা সর্বত্র সেইভাবেই পরিবর্তন ঘটিয়ে চলুক। এই লোকটা, সত্যিই, একটা প্রটোটাইপ মাত্র, যে আছে শুধু পরিবর্তনের সার্বজনীন রূপটাকে দেখাতে, যেমন নাটকে দেখায়। অতএব এবার আমরা তাকে ভুলে যেতে পারি।

২১শে এপ্রিল ১৯৮২

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ১৯৭১ সালের ১১ই ডিসেম্বর কার্জন পার্কের গাছের তলায়, খোলা আকাশের নিচে অথবা ১৮ই জুন ১৯৭২ কলকাতার এবিটিএ হলে চারদিক ঘিরে বসা দর্শকদের মাঝখানে একটি বিকল্প থিয়েটারের সূচনা করেছিলেন কতিপয় মানুষ, যা আজ তর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কি ছিল সেই ভিন্নরীতির নাটকের দার্শনিক ভিত্তিভূমি? এরকম তিনটি বইয়ের একটি The Changing Language of Theatre.